হ মুক্তি

| ঢাকা , বুধবার, ২০ মার্চ ২০১৯

অনেক শিক্ষাবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদ মনে করেন, শিশুদের শেখার ধরনের পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে শেখানোর ধরনেও পার্থক্য থাকা উচিত। আবার অনেক মনস্তত্ত্ববিদ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তাদের ধারণা, শেখার ভিন্ন ভিন্ন ধরন শ্রেণীকক্ষে শিশুদের ওপর তেমন কোন প্রভাব ফেলে না। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে কী? এ বিষয়ে আমার কিছু পর্যবেক্ষণ ও মতামত এ প্রবন্ধে উপস্থাপন করছি।

আমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাই সব শিশু একভাবে শেখে না। প্রতিটি শিশু আলাদা আলাদাভাবে শেখে। আবার শিখন শিশুর বয়স ও সামর্থ্যরে ওপর নির্ভর করে। শিশুর মন হচ্ছে শিখনের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিটি শিশুর নিজস্ব পছন্দ থাকে। তারা তাদের পছন্দ অনুসরণ করেই শেখে। শিশুরা সাধারণত অনুকরণপ্রিয়। কেউ দেখে, কেউ স্বাদ নিয়ে, কেউ স্পর্শ করে শেখে। আবার কেউ গান গেয়ে, কেউ ছবি এঁকে, কেউ খেলার ছলে, কেউ অনুকরণের মাধ্যমে শিখতে পছন্দ করে। শিশুদের শিখন কখনও জুটিতে, কখনও দলের সঙ্গে, আবার কখনও একাকী কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। শিখনের বিভিন্নতা শিশুদের নানান অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে। শিক্ষক শিশুদের পছন্দের কৌশল প্রয়োগ করে শিখনে সহায়তা দিলে শিশুদের শিখন প্রাণবন্ত, কার্যকর ও স্থায়ী হয়। অনেক শিশু পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যবহার এবং নিজ পছন্দের শিখন-কৌশল প্রয়োগ করার সুযোগ পেলে শিখনে বেশি আগ্রহী ও তৎপর হয়। সুতরাং শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার জন্য একজন শিক্ষককে শিশুদের শিখনের বিভিন্ন কৌশল ও ধরন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুর শেখার বিভিন্ন কৌশল : সব শিশু একভাবে শেখে না। অনেক শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর দৃঢ় বিশ্বাস জোরে জোরে পড়ার মাধ্যমে সেই শব্দ শুনে শুনে সবচেয়ে ভালো শেখা যায়। আবার দেখা যায় অনেক শিশু জোরে জোরে না পড়েও ভালো শিখতে পারে। আবার কেউ কেউ ছবি, মানচিত্র বা প্রতীকের মতো উপকরণের সহায়তায় তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারে। আসলে শিশুর শেখার কৌশলের শেষ নেই। একেক শিশু একেকভাবে শেখে। যেমন- শোনার মাধ্যমে, ছবি এঁকে, গল্প বলার মাধ্যমে, গানের মাধ্যমে, পড়ার মাধ্যমে, অনুকরণ করে, অনুসরণ করে, লেখার মাধ্যমে, অভিনয় করে, চিন্তা করে, যুক্তি খাটিয়ে, হাতে-কলমে কাজ করে, গণনা করে, খেলার মাধ্যমে, তুলনা করে, পর্যালোচনা করে, বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে, পরীক্ষা করে, গল্পের মাধ্যমে, দলে কাজ করে, স্বাদ গ্রহণ করে, অনুসন্ধান করে, স্পর্শের মাধ্যমে, নাচের মাধ্যমে, আলোচনা করে, দেখার মাধ্যমে, ভ্রমণের মাধ্যমে, অংশগ্রহণ করে, কল্পনা করে, অনুশীলন

করে, পুনঃলিখনের মাধ্যমে, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, মডেল বা চার্ট দেখে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, পুনরাবৃত্তি করে ইত্যাদি।
প্রতিটি শিশু অনন্য। প্রতিটি শিশুই অসীম সম্ভবনাময়। আজকের ছট্টো একটি শিশুর মধ্যে কী সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তা পূর্ব থেকে বলার কোন সুযোগ নেই। তাই প্রতিটি শিশুর প্রতি আমাদের আস্থা রাখতে হবে। কাউকে অবজ্ঞা বা খাটো করে দেখা যাবে না। সবাইকে সমভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। প্রতিটি শিশুর শিখন নিশ্চিতকরণের প্রতি আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। আবার যে দেখে শেখে সে যে শুনে বা অন্য কোনোভাবে শেখে না তাও ঠিক নয়। যে দেখার মাধ্যমে শেখে সে অন্যভাবেও শিখতে পারে। তবে দেখার মাধ্যমে সে সহজে শেখে। তার কারণ দৃষ্টির ছাপ তার শিখনকে দৃঢ় করে। মূলকথা ভিন্ন ভিন্ন শিশু ভিন্ন ভিন্নভাবে সহজে শেখে। কাজেই সব শিশুকে একভাবে শেখাতে চাওয়াটা যৌক্তিক নয়; এটি কার্যকর ও ফলপ্রসূও নয়। শিশু-শিখন কৌশলগুলোকে আমরা আবার শিখনের বিভিন্ন ধরন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। যেমন-
দৃষ্টিনির্ভর শিখন : দৃষ্টিনির্ভর শিক্ষার্থীরা উপস্থাপিত তথ্যগুলো দেখে খুব সহজেই কার্যকরভাবে শেখে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের অঙ্গভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গি শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দেয়।
শ্রবণনির্ভর শিখন : শ্রবণনির্ভর শিক্ষার্থীরা তথ্যগুলো বলে বা শুনে খুবই কার্যকরভাবে শেখে। এরা বক্তৃতা শুনে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভালোভাবে শেখে।
পঠননির্ভর শিখন : পঠননির্ভর শিক্ষার্থীরা কোন লিখিত বিষয়বস্তুর তথ্যগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে খুবই সহজে কার্যকরভাবে শেখে। যে সব শিক্ষক বোর্ড, ওভারহেড প্রজেক্টর ব্যবহার করেন বা পড়ার জন্য কোন বিষয়বস্তু সরবরাহ করেন তাদের কাছ থেকে এ ধরনের শিক্ষার্থীরা বেশি উপকৃত হয়।
অনুভূতি-স্পর্শনির্ভর শিখন : অনুভূতি-স্পর্শনির্ভর শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে তথ্যগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সহজে শেখে। অর্থাৎ এরা শরীরের নড়াচড়া এবং স্পর্শানুভুতি বা ছোঁয়ার মাধ্যমে শেখে। এ ক্ষেত্রে এ ধরনের শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমের কাজ এবং তাদের পরিবেশকে সক্রিয়ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সহজে শেখে।
পূর্বেই বলা হয়েছে, একেক শিশু একেকভাবে শেখে। অর্থাৎ একেক শিশুর বুদ্ধিমত্তা বা মেধা একেক রকম। গবেষণায় দেখা যায় শিশুরা কমপক্ষে নয় ধরনের বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে শেখে। যেমন- মৌখিক ও ভাষাবৃত্তিয় বুদ্ধিমত্তা, যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা, দৃষ্টি ও অবস্থানমূলক বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতি ও শরীরবৃত্তিয় বুদ্ধিমত্তা, ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধিমত্তা, অন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা, আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা, প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তা ও আধ্যাত্মিক বুদ্ধিমত্তা। এ বুদ্ধিমত্তাগুলো মানুষের মস্তিষ্কের কতগুলো নির্দিষ্ট

স্থানে বিদ্যমান। আর এ নির্দিষ্ট স্থানগুলো কখনও স্বাধীনভাবে কখনও-বা সমষ্টিগতভাবে পরিচালিত হয়। এ বুদ্ধিমত্তাগুলোর মাত্রাও সব শিশু তথা মানুষের ক্ষেত্রে সমান নয়। কারও কোন বুদ্ধিমত্তা প্রবল/প্রকট, আবার কারও কোন বুদ্ধিমত্তা দুর্বল/প্রচ্ছন্ন। আচরণ ও কার্যকলাপ থেকে এ পার্থক্য সহজে বোঝা যায়। ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিমত্তার লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন। যেমনÑ আমরা বলতে পারি বরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌখিক ও ভাষাবৃত্তিয় বুদ্ধিমত্তা এবং ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধিমত্তা প্রবল ছিল। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের দৃষ্টি ও অবস্থানমূলক বুদ্ধিমত্তা, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তা, আইনস্টাইন এবং নিউটনের যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা প্রবল ছিল। ম্যারাডোনা ও সাকিব আল হাসানের অনুভূতি ও শরীরবৃত্তিয় বুদ্ধিমত্তা এবং রুনা লায়লার ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধিমত্তা প্রবল।

শিশুর শিখনের জন্য উপযুক্ত কৌশল ব্যবহারের পাশাপাশি শিখনউপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা আবশ্যক। শিশুর শেখার জন্য পরিবেশ একটি অপরিহার্য উপাদান। শিখন পরিবেশের প্রকৃতির ওপর শিশুর শিখন-অর্জন নির্ভরশীল। শিখন-শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী স্তরভিত্তিক পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষককে এমন পরিবেশ ও কলা-কৌশল (শ্রেণীকক্ষের ভৌত পরিবেশ, শিক্ষকের কার্যাবলি, শিক্ষার্থীদের কার্যাবলি) অবলম্বন করতে হবে যাতে শ্রেণীতে উপস্থিত সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট পাঠের শিখনফল অর্জন সম্ভব হয়। শিশুর শিক্ষালাভের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার ব্যাপারে শিক্ষক ও অভিভাবককে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। সঠিক পরিবেশ না পেলে শিশুর শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে না। শিশুরা তার চারপাশের পরিবেশ ও মানুষের সঙ্গে মিশে, কথাবার্তা বলে ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে শেখে। আমাদের এমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে শিশু তার সব ইন্দ্রিয় ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক ও কার্যকর শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত ও কার্যকর শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগ করে শিশুদের শিখতে সহায়তা করেন। শিশুরা বিভিন্ন শিখন-অভিজ্ঞতা নিয়ে স্কুলে আসে। তাদের শিখন-অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনে শিশুদের উদ্বুদ্ধকরণে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। এ জন্য শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে কিছু শিশুকেন্দ্রিক কৌশলের সহায়তা নিতে হয়। হতে পারে এককভাবে কাজ, বড় দলে কাজ, ছোট দলে কাজ, জোড়া/জুটিতে কাজ, ব্রেনস্টর্মিং, প্রতিফলন, অনুশীলন ইত্যাদি। শিক্ষক প্রয়োজনীয় কৌশল সঠিক সময়ে প্রয়োগ করে শিশুকেন্দ্রিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করলে শিশুদের শিখনফল অর্জন নিশ্চিত হয় ও শিখন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয়। এ জন্য শিক্ষককে বিশেষ কিছু দিকের প্রতি নজর দিতে হয়। যেমনÑ বিদ্যালয়ের পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, বস্তুগত পরিবেশ, বাড়ির পরিবেশ, এলাকা বা কমিউনিটির পরিবেশ।

বিদ্যালয়ের পারিবেশ : বিদ্যালয়ে আকর্ষণীয় ও আনন্দময় পরিবেশ নিশ্চিত করা, বিদ্যালয়টি দেখতে যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবহার নিশ্চিত করা, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় গাছপালা ও বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষাদি লাগানো, বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় বাগান করা, বিদ্যালয় ভবনটি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা, শিশুদের বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ বিদ্যালয়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার্থী অনুপাতে শ্রেণীকক্ষের আয়তন নির্ধারণ, শিশুদের কাজের জন্য ডেস্কে পর্যাপ্ত জায়গা রাখা, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন আসবাবপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা, ব্ল্যাকবোর্ড পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা, শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা রাখা, পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ করা এবং শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

সামাজিক পরিবেশ : শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি। যেমনÑ শিশুর মানসিক আনন্দ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সামাজিক কার্যক্রমে শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, শিশুকে ভালোবাসা ও আনন্দে রাখা, শিশুর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, শিশুর সঙ্গে মেলামেশা ও খেলার সুযোগ তৈরি করা, শিশুকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ তৈরি করে দেয়া, অভিভাবকদের সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

বস্তুগত পরিবেশ : শিশুর বয়স ও বিকাশ উপযোগী উপকরণ থাকা, আকর্ষণীয় খেলনা সামগ্রী সরবরাহ করা, বন্ধু-বান্ধব ও খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে দেয়া, শিশুর মতামতকে গুরুত্ব দেয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা, শিশুর জন্য নিরাপদ পানি ও পুষ্টি নিশ্চিত করা, শিশুর জন্য পর্যাপ্ত খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা, সৃজনশীল কর্মকা-ের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি রাখা, সৃজনশীল কাজে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করা, ওষুধপত্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ/ক্ষতিকারক দ্রব্যাদি শিশুদের হাতের নাগালে না রাখা, শিশুর বাইরে খেলার সুযোগ রাখা, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপকরণাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখা ইত্যাদি।

বাড়ির পরিবেশ : শিশুর জন্য খেলনা সামগ্রী থাকা, পর্যাপ্ত আনন্দ-বিনোদনের ব্যবস্থা থাকা, খেলার জন্য বিশেষ ক্ষেত্র বা কর্নার থাকা, বড়দের সহযোগিতামূলক আচরণ থাকা, শিশুদের মতামত প্রকাশের সুযোগ করে দেয়া, শিশুর প্রতি পরিবারের সবার নজর রাখা, অন্য শিশুদের সঙ্গে মেলামেশার ও খেলার সুযোগ থাকা, শিশুদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ থাকা ইত্যাদি।

এলাকা বা কমিউনিটির পরিবেশ : শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণে এলাকাবাসী ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। যেমনÑ শিশুর জন্য খেলার মাঠ থাকা, ছোট শিশুর জন্য নিরাপদ ক্ষেত্র থাকা, দৌড়-ঝাঁপ দেয়ার মতো ব্যবস্থা থাকা, বড়দের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া, রাস্তাঘাট ও

অন্যান্য চলাচলের জায়গা শিশুকেন্দ্রিক হওয়া, এলাকা যেন শিশুবান্ধব হয় এবং আঘাত না পাওয়া বা শারীরিক ঝুঁকিমুক্ত হয়।
শিখন-শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী স্তরভিত্তিক পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষককে এমন পরিবেশ ও কলা-কৌশল অবলম্বন করতে হবে যাতে শ্রেণিতে উপস্থিত সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং সব শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট পাঠের শিখনফল অর্জন নিশ্চিত হয়। শিশুর শেখার জন্য পরিবেশ একটি অপরিহার্য উপাদান। শিখন পরিবেশের প্রকৃতির ওপর শিশুর শিখন অর্জন নির্ভরশীল। সঠিক পরিবেশ না পেলে শিশুর শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে না। শিক্ষক প্রয়োজনীয় কৌশল সঠিক সময়ে প্রয়োগ করে শিশুকেন্দ্রিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করলে শিশুদের শিখনফল অর্জন নিশ্চিত হয় ও শিখন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয়। সঠিক নির্দেশনা প্রদান, ইতিবাচক ফলাবর্তন প্রদান, উপকরণের যথাযথ ব্যবহার, প্রশ্ন করা এবং উত্তর দেয়ার জন্য প্রশংসা করা, শ্রেণীর সব শিক্ষার্থীর উদ্দেশে প্রশ্ন করা, প্রশ্ন করার পর চিন্তা করার সুযোগ দেয়া ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে পারেন।
শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের কাজ : শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নজর রাখতে হয়। যেমন- উপকরণের ব্যবহার, দলীয়/জোড়ায় কাজ, সঠিক নির্দেশনা প্রদান, ইতিবাচক ফলাবর্তন প্রদান, শিক্ষকের কণ্ঠস্বর, শিক্ষকের অবস্থান, চক-বোর্ডের ব্যবহার করার কৌশল, সব শিক্ষার্থীর সঙ্গে দৃষ্টি সংযোগ, যথার্থ দৈহিক ভাষার ব্যবহার, হাত তোলার অভ্যাস গড়ে তোলা, শিক্ষার্থীর নাম ধরে ডাকা, অপারগ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সহায়ত দান, শিশু দ্বারা শিখনের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার্থীদের বোর্ডে লেখার সুযোগ দেওয়া, প্রশ্ন করা এবং উত্তর দেয়ার জন্য প্রশংসা করা, শ্রেণীর সব শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা, প্রশ্ন করার পর চিন্তা করার সুযোগ দেয়া, শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রশ্নের আহ্বান করা বা তাদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা, পাঠ চলাকালীন চেয়ারে না বসা, যারা কম কথা বলে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে উৎসাহিত করা, পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বিষয়বস্তু থেকে প্রশ্ন করা, শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা/উপলব্ধি যাচাই-এর জন্য প্রশ্ন করা, হ্যাঁ/না উত্তর হয় এমন প্রশ্ন পরিহার করা, উন্মুক্ত প্রশ্ন করা/সৃজনশীলতা যাচাই-এর জন্য প্রশ্ন করা, শিক্ষার্থীর জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল রেখে প্রশ্ন করা, কঠিন প্রশ্নের ক্ষেত্রে বারবার বলা এবং উত্তরও একাধিকবার বলা, অমনোযোগী এবং কর্মবিমুখ শিক্ষার্থীদের সামনের সারিতে বসতে দেয়া, ভালো কাজ এবং ভালো লেখা প্রদর্শন করা, নাম ধরে ডাকা, ভালো কাজের জন্য প্রশংসা করা ও অন্যদের অনুকরণ করতে বলা, বোর্ডে লেখার সময় বিষয়বস্তু মুখেও বলা, যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে লেখা, লেখার আকার এমন হতে হবে যেন সবার কাছে দৃশ্যমান হয়, যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে লেখা, পাঠের শিরোনাম

বোর্ডের মাঝামাঝি উপরে লেখা, লেখার সামনে দাঁড়িয়ে না লেখা, শিক্ষক-যোগ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, বিষয়জ্ঞান থাকা, সময়জ্ঞান থাকা, সব শিক্ষার্থী কাছাকাছি যাওয়া, শিক্ষার্থীদের চাহিদা মোতাবেক শিখন-কৌশল প্রয়োগ ইত্যাদি।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর কাজ : শ্রেণীকক্ষে বা শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের কাজ দিয়ে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারেন। যেমনÑ একাকী চিন্তা করতে দেয়া, দলে আলোচনা করতে দেয়া, জোড়ায় আলোচনা করতে দেয়া, দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, জানার কৌতুহল সৃষ্টি করা, শ্রেণীকক্ষে মনোযোগী রাখা ইত্যাদি। শিক্ষকের নির্দেশ মানা, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া, দলীয় কাজে সবার মতামতকে প্রাধান্য দেয়া, শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণীতে প্রবেশ করা ও শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করা, সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণীতে বসা, শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্শ্ব-আলাপ পরিহার করা, শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, প্রাসঙ্গিক কথা বলা বা আলোচনা করা, ক্লাস চলাকালীন শ্রেণীকক্ষের ভেতরে বা বাইরে ঘোরাফেরা না করা, শিক্ষকের সঙ্গে সবসময় দৃষ্টি-সংযোগ রক্ষা করা, কোন প্রশ্ন না বুঝলে তা জানতে চাওয়া, প্রশ্নের উত্তর দিতে হাত তোলা, বন্ধু দলে কাজ করা, সবার সঙ্গে সমান মেশা, হ্যাঁ/না উত্তর হয় এমন প্রশ্ন পরিহার করা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ত্বরান্বিত করতে পারে।

নতুন নতুন গবেষণার ভিত্তিতে পশ্চিমা মনস্তত্ত্ববিদরা বলেছেন, প্রতিটি শিশুর শেখার ধরনের পার্থক্য থাকার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনস্তত্ত্ববিদরা শিশুর শেখার ধরনের পার্থক্যের ওপর অন্তত ৭১টি ভিন্ন অনুকম্পা তৈরি করেছেন। মহান সৃষ্টিকর্তা সব শিশুকেই মেধা, বুদ্ধি দান করেছেন। পাশাপাশি দান করেছেন শেখার কৌশলও। সব শিশুই শেখার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষাপটে তা বিভিন্ন রকম হয়। একেক শিশু একেকভাবে শেখে। কেউ অল্পতেই শিখতে পারে, আবার কেউ সহজে শিখতে পারে না। কারও মেধা বা বুদ্ধিমত্তা অল্প সময়ে বিকশিত হয়, আবার কারো দীর্ঘদিন সুপ্ত থাকার পর বিকশিত হয়। কারও মেধা আস্তে আস্তে বিকশিত হয়, আবার কারও মেধা সঠিক যতœ ও পরিচর্যার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। আজকের সুস্থ, সবল ও বুদ্ধিদীপ্ত মেধাবী শিশু আমাদের ভবিষ্যৎ। তাই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কর্ণধার এ শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশে পিতামাতা, পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণকারী শিশুর ওপর নিজের ইচ্ছা, প্রভাব, স্বপ্ন চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। শিশুর সুষ্ঠু ও যথাযথ বিকাশের জন্য কোন শিশু কোন মেধাসম্পন্ন বা কোন বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন তা জানা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। তার পছন্দের কৌশল অনুযায়ী শেখাতে পারলে সে সহজেই শেখে। পাশাপাশি শিশুকেন্দ্রিক শিশুশিক্ষার সঠিক পরিবেশ নিশ্চিতের ওপরও আমাদের

যথাযথ নজর দিতে হবে। বিষয়টির প্রতি সকলেরই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া উচিত।